ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (১)

আকাশ মালিক

(বেশ কিছু পাঠকের বিশেষ অনুরুধ রক্ষার্থে লিখাটি পুনঃপ্রচার করা হলো)

কোরায়েশ বংশের দুই শাখায় নবী মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত ওসমানের (রাঃ) জন্ম। তাঁদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন আবদে মনাফ। আবদে মনাফের দুই পুত্র ছিলেন, আবদে শামস ও আবদে হাশিম। আবদে শামসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া নেতৃত্বের দাবী করায় চাচা আবদে হাশিমের সাথে বিবাদ বাঁধে। এই বিবাদে কোরায়েশ বংশ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হাশিমী ও উমাইয়া। বিবাদের মূল কারণ ছিল সম্পদ। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ভাগাভাগি করা হয় এই ভাবে- কা'বা গৃহের স্বত্তাধিকার ও তত্ত্বাবধান এবং হজ্ব (দেব-দেবী দর্শন) মৌশুমে আয়কৃত অর্থের মালিকানা থাকবে হাশিমী গোত্রের হাতে। আর দেশ প্রতিরক্ষা প্রশাসন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানা উমাইয়া দলের হাতে। পরবর্তিতে উমাইয়া বংশ বুঝতে পারলো এই ক্ষমতা ভাগাভাগিতে তাদের যথেষ্ঠ ক্ষতি হয়ে গেছে। নবী মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম পূর্ববর্তি আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা ধর্মীয় জিহাদ ছিলনা বল্লেই চলে। নগর শাসনে উমাইয়াদের অর্থোপার্জন, কা'বা গৃহের আয়ের তুলনায় ছিল অতি নগন্য। ধনে-মানে উমাইয়া গোত্র, হাশিমীদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়লো। কিন্তু তারা সামরিক বিভাগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতি, কুটনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক আগাইয়া গেল। এবার অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণে বুদ্ধিমান উমাইয়াগণ ঝাপিয়ে পড়লো ব্যবসা-বানিজ্যে। কুটনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা যেমন ব্যবসা-বানিজ্যে, অর্থোপার্জনে প্রচুর উন্নতি করে, উপরন্তু বহির্বিশ্বের সাথেও সু সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উমাইয়া ও হাশিমী দুই দলের মধ্যকার বৈষম্য, বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ দিনদিন বাড়তে থাকে। আর তা এক পর্যায়ে হাশিমী দলের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, একাদশ সন্তানের জনক আব্দুল মোত্তালিবের সময়ে চরমাকার ধারন করে। আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ্ ও আবুতালিবের ঔরসে যথাক্রমে মুহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলীর (রাঃ) জন্ম।

উমাইয়ার দুই পুত্র ছিলেন। হারিব ও আবুল আ'স। হারিবের ঘরে জন্মগ্রহন করেন আবুসুফিয়ান আর আ'সের ঘরে হাকাম ও আফ্ফান। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে, যে বৎসর ইয়েমনের বাদশাহ আবরাহা মক্কা আক্রমন করেন, সে বৎসর হাশিমী গোত্রের আব্দুল্লাহ্র গৃহে মুহাম্মদ (দঃ) জন্ম গ্রহন করেন। তার ছয় অথবা সাত বৎসর পর উমাইয়া বংশের আফ্ফান পত্মী উরদীর গর্ভে হজরত উসমানের (রাঃ) জন্ম হয়। শিশু বয়সে যেমন মুহাম্মদ (দঃ) পিতা আব্দুল্লাহ্কে হারিয়ে চাচা আবুতালিবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হোন, হজরত উসমান (রাঃ) ও কিশোর বয়সে পিতা আফ্ফানকে হারিয়ে চাচা হাকামের আশ্রয় গ্রহন করেন। উমাইয়া ও হাশিমীদের আত্মকলহ ও গোত্রীয় সংঘাতে আরব যখন অবনতির চরম পর্যায়ে তখনই বিপরীতমূখী মুক্ত-বুদ্ধি চর্চার একদল মুক্ত-মনার আবির্ভাব ঘঠে। এই দলকে হানিফী নামে আখ্যায়িত করা হয়। মুহাম্মদ (দঃ) তখন যুবক। ওয়ারাকা

বিন-নো'ফেল ও যায়ীদ বিন-ওমর ছিলেন সেই দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। উল্লেখ্য, ওয়ারাকা বিন নো'ফেল, হজরত খাদিজার (রাঃ) চাচাতো ভাই ও মুহাম্মদের (দঃ) ধর্ম-গুরু। তিনি খাদিজা ও মুহাম্মদের (দঃ) বিয়ের ঘটকও ছিলেন। হানিফী দল পৌত্তলিক ধর্মের ওপর প্রকাশ্যে অনাস্থা ঘোষনা করে বসে। ফলশ্রুতিতে তাদের অনেককেই দেশান্তরী হতে হয়। ওয়ারাকা বিন-নো'ফেল ও যায়ীদ বিন-ওমর ছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) অতি প্রীয়ভাজন। এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন পরবর্তিতে মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্ম ইসলাম আবিস্কারের প্রথম ও প্রধান সহায়ক। ওয়ারাকা বিন-নো'ফেল ছিলেন তাওরাত, যবুর ও ইনজিল কিতাবে বিশেষজ্ঞ আর যায়ীদ বিন-ওমর ছিলেন একজন কবি ও সাহিত্যিক। কোরানের কাব্যিক রূপ, ছন্দ ও শব্দ-চয়ন যায়ীদ বিন-ওমরের কাছ থেকে ধারকৃত। মুহাম্মদ (দঃ) গরীব ছিলেন কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন না। চাচা আবুতালিবের সাথে ব্যবসা বানিজ্যের উদ্দেশ্যে শ্যাম, সিরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমনের সাথী হতেন। ব্যবসার হিসেব নিকেশের পূর্ণ দক্ষতাই বিত্তশালী খাদিজাকে মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ৬১০ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম ইসলামের নাম ঘোষনা দেন। মক্কা নগরীতে আগুন জ্বলে উঠলো। হাশিমী বংশদ্ভুত মুহাম্মদের (দঃ) এই নতুন ধর্ম ঘোষনায় অপমানবোধ করলো উমাইয়া দল, আর মুহাম্মদের (দঃ) স্বীয় গোত্রের লোকজন পৌত্তলিকতার অবসানে, দেব-দেবীর কল্যাণে কা'বা গৃহের বিপুল আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার আশংকায় হলো উৎকন্ঠিত।

এদিকে হজরত উসমান (রাঃ) চাচা হাকামের সহযোগীতায় ব্যবসা বানিজ্যে প্রচুর উন্নতি করতঃ দেশ-বিদেশে সুপরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসার সুত্র ধরেই একদিন ব্যবসায়ী আবু-বকরের (রাঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়।

হজরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবেগ প্রবন, সরল প্রকৃতির সুদর্শন যুবক। ধনে-মানে উসমান (রাঃ) সুখী হলেও মনে প্রানে সুখ ছিলনা। পিতা আফ্ফানের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা উর্দি (ওরয়া) যে লোকটিকে বিয়ে করেন, উসমান (রাঃ) তাকে সহ্য করতে পারতেন না। মনের দুঃখে একদিন ঘর ছেড়ে মক্কায় চলে আসেন। উসমান (রাঃ) মুহাম্মদের (দঃ) প্রথম কন্যা রোকেয়াকে ভালবাসতেন এবং মনে মনে তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষন করতেন। কিন্তু যখন একদিন শুনতে পেলেন রোকেয়ার বিয়ে অন্যত্র হয়ে গেছে, উসমান (রাঃ) খুবই দুঃখ পেলেন। একদিন সেই দুঃখ মোচনের সুবর্ণ সুযোগটি সৃষ্টি করে দিলেন তাঁর নব্য ব্যবসায়ী বন্ধু আবু-বকর (রাঃ)। মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নতুন ধর্ম ইসলাম ঘোষনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই চল্লিশ বছর বয়স্কা, দুইবার বিবাহিতা, বিপুল সম্পদের অধিকারিণী খাদেজাকে বিয়ে করেন। মুহাম্মদ (দঃ) ভালভাবেই জানতেন, বাহু-বল ও অর্থ-বল ছাড়া তাঁর নতুন ধর্ম সুতিকা-ঘরেই মারা যাবে। তাই আপন কন্যা অল্প বয়সের রোকেয়া ও উম্মে কলসুমকে, তাঁর চাচাতো ভাই, ইসলামের চরম শত্রু আতিবা ও উতবা ইবনে আবুলাহাব, দুই অমুসলিম সহোদর ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেন। উম্মে কলসুম বিবাহকালে অপ্রাপ্ত বয়স্কা (না-বালিগা) ছিলেন। নবী কন্যাদ্বয়ের বিবাহ ইসলামের শরীয়ত মোতাবেক অবশ্যই ছিলনা। আতিবা ও উতবা মুহাম্মদের (দঃ) নতুন ধর্ম আবিস্কারের সংবাদ শুনে নবীজীর প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণাই শুধু প্রকাশ করলো না, উপরন্তু তাঁর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। মুহাম্মদ (দঃ) অন্তরে খুবই দুঃখ পেলেন কিন্তু কিছু করার শক্তি ছিল না। রোকেয়াকে নিয়ে উসমানের (রাঃ) মনের গোপন বাসনা আবু-বকর (রাঃ) জানতেন। এই সুযোগে সংবাদটা মুহাম্মদের (দঃ) কানে

পৌছালেন। মুহাম্মদ (দঃ) এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। বাহু-বল অর্জনের প্লান ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এবারে অর্থ-বলের সুযোগটা হাত ছাড়া করা যায় না। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহনের শর্তে মেয়ে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। উসমান (রাঃ) খুশী মনে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে রোকেয়ার সাথে প্রনয়সুত্রে আবদ্ধ হলেন। আরবের একটি ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত পরিবারে, সোনার চামচ মুখে নিয়ে যে উসমানের (রাঃ) জন্ম, সেই উসমান (রাঃ) এমন কান্ড করে বসবেন উমাইয়া বংশের কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। চাচা হাকামের, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উসমানের বিয়ে সম্পন্ন করার সকল সপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। নব বধুকে নিয়ে তায়েফের রাজপ্রসাদে উসমানের (রাঃ) আর যাওয়া হলো না। কিছু দিন পরেই, তিরস্কার আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মক্কা থেকে বিতাড়িত নব্য মুসলিম দলের সাথে নব বধুকে নিয়ে উসমান পার্শ্ববর্তি খৃষ্টান রাষ্ট্র আবিসিনিয়ায় গমন করেন। দরিদ্র দেশ আবিসিনিয়ায়, উসমান (রাঃ) ব্যবসা-বানিজ্যের অনেক চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। আবিসিনিয়ায় সুদীর্ঘ আট বৎসর সীমাহীন দুঃখ কষ্টের মধ্যে অবস্থানকালে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে, একদিন রোকেয়ার কাছে খবর আসলো, এক কালের আরবের সুনাম ধন্যা মহিলা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারিনী, মা জননী বিবি খাদিজা অতিশয় অভাব অনটনের মধ্যে, রোগাক্রান্ত হয়ে, ঔষধ-পথ্য বিহীন ভাবে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। হায়রে খাদিজা ! কোথায় গেলো তোমার ব্যবসা-বানিজ্য, কোথায় তোমার ধন-সম্পদ ? মাতৃশোকে রোকেয়ার শুধু মনই ভাঙ্গেনি, তাঁর দেহও ভেঙ্গে যায়। রোকেয়া রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

৬২২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ (দঃ) কুরায়েশ কর্তৃক তাঁর প্রান নাশের আশংকায় রাতের অন্ধকারে আবু-বকরকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনাভিমুখে পালিয়ে যান। ইসলামের ইতিহাসে ইহাকে ‘হিজরত’ বলা হয় এবং ঐ দিন থেকে হিজরী সন গণনা করা হয়। তখন মুহাম্মদের (দঃ) বয়স ছিল তিপ্পান্ন, আর তাঁর প্রকাশিত ধর্মের চলছিল তেরো বৎসর। উল্লেখ্য আবু-বকর যখন মুহাম্মদকে (দঃ) নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন তখন তাঁর মেয়ে আয়েশার বয়স ছিল পাঁচ। মদীনায় এসেই মুহাম্মদ তাঁর বৈরাগী লেবাসের অন্তরালে লুকায়ীত রাজনৈতিক ইসলামের প্রস্তুতি নেন। এক হাতে তাসবিহ্ আর এক হাতে তলোয়ার।

উসমান (রাঃ) হিজরী দুই সনে আবিসিনিয়া থেকে স্বস্ত্রীক মদীনার পথে যাত্রা করেন। পীড়িত, ক্ষীণ-স্বাস্থের রোকেয়া তখন গর্ভবতী। পথিমধ্যে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। রোকেয়ার স্বাস্থের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হতে থাকে। কিছুদিন পর রোকেয়া যখন মৃত্যু শয্যায় শায়ীতা, মুহাম্মদ (দঃ) তখন তাঁর তের বৎসরের তৈরী তিন শতো তেরো জন অনুসারী সৈনিক নিয়ে, মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিন পশ্চিমে, বদর প্রান্তে যুদ্ধরত। মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া থেকে মক্কাভিমূখী একদল কোরায়েশ বণিকের পথ রুখে দাঁড়ান। মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। হঠাৎ আক্রমনে বণিকদল হতভম্ব হয়ে যায়। মক্কার কোরায়েশগণ জানতে পারলো যুদ্ধ ব্যতিত বণিকদলকে মুহাম্মদের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বদর প্রান্তে সংঘটিত হলো ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধ। মুসলমানদের পক্ষে স্বয়ং মুহাম্মদ সেনাপতির দায়ীত্বে। বদর প্রান্তর সত্তরটি তাজা প্রাণের রক্তে রঞ্জিত হলো। রক্তের মাঝে খোঁজে পেল কিশোর ইসলাম বেঁচে থাকার অপূর্ব স্বাধ । উসমান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন নি। সেনাপতি মুহাম্মদ (দঃ) সত্তর জন

মানুষকে খুন ও ততসম মানুষকে বন্দী করে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। বিজয়ীর বেশে গর্বিত সৈন্যদল নিয়ে মুহাম্মদ (দঃ) যখন গৃহে ফিরলেন, রোকেয়া তখন এই পৃথিবীতে আর নেই। রোকেয়ার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হলো, বিজয় উৎসব করা মুহাম্মদের (দঃ) আর হলো না। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা (সম্পদ ও ক্ষমতা বিস্তার) বাস্তবায়নের পথে উৎসাহ ও আশা সঞ্চারিত হলো। মুহাম্মদ (দঃ) অতি সত্বর আরেকটি যুদ্ধের আয়োজনে মনযোগ দিলেন।

পত্মী বিয়োগে শোকাহত উসমান (রাঃ) কিছুদিন পরেই পুরোদমে ব্যবসা বানিজ্যে আত্ম-নিয়োগ করলেন। ব্যবসায় সু-পরিচিত উসমান (রাঃ) পূর্ব অভিজ্ঞতায় রাতা-রাতি প্রচুর উন্নতি করলেন। এতদিনে, কিশোর বয়সে তালাক প্রাপ্তা মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় কন্যা উম্মে-কলসুম পূর্ণ যুবতী। উসমান (রাঃ) কলসুমের প্রেমে পড়লেন। নবীজীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ধনে-মানে, রূপে-গুণে অতুলনীয় উসমানের (রাঃ) প্রস্তাব স্বাদরে গৃহীত হলো। মুহাম্মদের (দঃ) দুই কন্যার পাণি গ্রহনের কারনে উসমান (রাঃ) ‘যি-ন্নুরাইন’ অর্থাৎ যুগল নুরের অধিকারী উপাধী পেলেন।

প্রথম যুদ্ধের মাত্র একবৎসর পরেই, হিজরী তৃতীয় সনে, মদীনা থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে ওহুদ প্রান্তরে কোরায়েশদের সাথে মুহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। এবারে শিশু ইসলাম শুধু রক্তই পান করলো না, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অমৃত স্বাধও গ্রহন করলো। লাগাতার তিনটি যুদ্ধে (বদর, ওহুদ, আহ্যাব) বিজয়ী মুসলমানগন প্রচুর সম্পদ লাভ করলেন, এবং শত্রু-পক্ষের অনেক শিশু-কিশোর নর-নারীকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন, যুদ্ধ একটি অকল্পনীয় লাভজনক ব্যবসা। উসমান (রাঃ) ওহুদ ও আহ্যাব যুদ্ধে সেনাপতি মুহাম্মদের (দঃ) পাশে পাশে ছিলেন। পরাজিত কোরায়েশগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। ইসলাম ত্রাসের সৃষ্টি করলো সারা আরব বিশ্বে। ষষ্ঠ হিজরীতে মুহাম্মদ (দঃ) বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনি-মুস্তালিক গোত্রের ইহুদীদেরকে আক্রমন করেন। এই যুদ্ধে ইহুদীগণ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের বহু নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যায়। নিজ শহরের বাইরে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমন ডিফেন্সিভ হয়না। মুহাম্মদ কর্তৃক বেশীর ভাগ যুদ্ধই ছিল অফেন্সিভ। বনি-মুস্তালিক গোত্র, বা সিরিয়া থেকে বানিজ্য করে বাড়ি ফেরার পথে কোরায়েশ বনিকদল মদীনা আক্রমন করে নাই। এবারে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের মন-মানসিকতা ও শক্তি পরীক্ষার লক্ষ্যে চৌদ্দ শত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মক্কা নগরী দখলের আয়োজন করলেন। মক্কা শহর থেকে ছয় মাইল দূরে হোদায়বিয়ার উপত্যকায় এসে তারা আর অগ্রসর হলেন না। অনেক দেরীতে হলেও মক্কাবাসী দেখতে পেলো সন্নাসী লেবাসের ভেতরে মুহাম্মদের ভয়ানক রাজনৈতিক চেহারা। এক সাথে চৌদ্দ শত মানুষ নিয়ে মুহাম্মদের (দঃ) আগমন সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ আগে থেকেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিলেন। মুহাম্মদের (দঃ) বার্তা-বাহক হয়ে উসমান (রাঃ) কোরায়েশ নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে বল্লেন যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেন নি, এসেছেন কা’বা ঘর দর্শন করতে। কোরায়েশদের মন থেকে বদরের রক্তের দাগ তখনও শুকায়নি। উসমানকে (রাঃ) বন্দী করা হলো। খবর পেয়ে মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠলেন। নবীজীর হাতে হাত ধরে মৃত্যু-শপথ নিলেন, মক্কা জয় না করে তারা ফিরে যাবেন না। ইসলামের ইতিহাসে এই শপথ ‘বাইয়্যাতে রেজওয়ান’ নামে অভিহিত। হজ্জ (দেব-দেবী দর্শন) উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কতিপয় উপজাতীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে আপাতত দুই পক্ষ মারাত্মক বিপর্যয়

থেকে রক্ষা পেল। তারা উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন, যা ঐতিহাসিক 'হোদাইবিয়া সন্ধি' নামে পরিচিত। আরব বিশ্বে মুহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী অপ্রতিরোদ্ধ এক বিরাট মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তারা বিনা যুদ্ধে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরী দখল করে নেন। বদর থেকে তবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে নয়টি যুদ্ধে মুহাম্মদ (দঃ) সেনাপতির দায়ীত্বে ছিলেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে আরাফাতের ময়দানে তিনি তাঁর শেষ ঐতিহাসিক ভাষন দেন। এই ভাষনের দুই মাস পরেই ৬৩ বছর বয়সে মুহাম্মদ (দঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, তখন আবু-বকর তনয়া, নবীজীর স্ত্রী আয়েশার বয়স আটারো।

মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরপরই অগণতান্ত্রীক ভাবে ক্ষমতা দখল করে বসেন হজরত আবু-বকর (রাঃ)। ক্ষমতার মোহে, মক্কা থেকে পালিয়ে আসা কোরায়েশ নেতাগন, মদীনার আন্সারীদের অবদান ভুলে গেলেন। মদীনাবাসীর কোন দাবী ও প্রতিবাদ তারা কানেই তোল্লেন না। মদীনার মুসলমান নেতা হজরত সা'দ (রাঃ) পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, খলিফা নির্বাচিত হবে মদীনার আন্সারীদের ভেতর থেকে। মদীনাবাসী শেষ পর্যন্ত মক্কার একজন এবং মদীনার একজন করে দুই খলিফা মেনে নিতে রাজী হলেন। তাদের এ দাবীও প্রত্যাখ্যান করা হলো। মদীনার ঘরে বাইরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। হজরত আলী ও হজরত ফাতিমা (রাঃ) আবুবকরকে (রাঃ) প্রথম থেকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। মুহাম্মদের (দঃ) কনিষ্ঠ মেয়ে হজরত ফাতিমা (রাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মদের (দঃ) মালিকানায়, মদীনা ও খায়বারে রক্ষিত কিছু সম্পত্তি দাবী করায়, এ নিয়ে আবুবকরের সাথে তাদের মনোমালিন্য হয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস পর বিভিন্ন সামাজিক দিক চিন্তা করে আলী (রাঃ) আবুবকরের (রাঃ) খেলাফত মেনে নেয়ায় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আবুবকরের শাসনামলে, মুহাম্মদের (দঃ) সময়ের জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত মানুষগণ বিদ্রোহ ঘোষনা করলো। অমুসলিম সরকারগণ তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত জিজিয়া-কর দিতে অস্বীকার করলো। মুহাম্মদ কর্তৃক সৃষ্ট দশ বৎসরের সংঘাতময় অশান্তির জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চাইলো। অনেক মুসলমান তাদের পূর্ববর্তি ধর্মে ফিরে গেলো। বাহরাইনের শক্তিশালী বনু-বকর গোত্রের লোকজন (যারা প্রান রক্ষার্থে মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে ইসলাম গ্রহন করেছিল) প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করলো। কিছু ওম্মান বংশীয় লোকেরাও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিল। আবু-বকর (রাঃ) জনগণের ওপর স্বৈরাচারী ষ্টীম-রোলার চালিয়ে দিলেন। সেনাপতির দায়ীত্বে নিয়োগ করলেন দুর্ধষ সাহাবী খালিদ বিন অলিদকে (রাঃ)। উল্লেখ্য, 'মুতা' যুদ্ধে যায়েদ নামক, মুহাম্মদের (দঃ) এক ক্রীতদাস নিহত হয়েছিলেন। এর প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া আক্রমনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। মুহাম্মদের (দঃ) সেই অসম্পূর্ণ কাজটি পূর্ণ করতে, আবু-বকর (রাঃ) প্রথমেই আক্রমন করলেন সিরিয়ার ওপর। ইরানের খসরু পারভেজ, যিনি এক সময় মুহাম্মদকে (দঃ) বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবু-বকর (রাঃ) তাঁকেও শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ইরান আক্রমন করার প্রস্তুতি নিলেন। অনেক মুসলমান নেতাগণ এই আক্রমনের বিরোধীতা করেছিলেন। আবু-বকরের (রাঃ) নির্দেশে খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) বেপরোয়া হয়ে একের পর এক গোত্রের ওপর নৃশংস আক্রমন চালাতে থাকেন। এক সাথে আবু-বকরের (রাঃ) জঙ্গী কমান্ডারগণ ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে। বাহরাইনে আ'লা বিন হাদরামি, ইরানের দক্ষিন সীমান্ত থেকে ব্যাইজেনটাইন পর্যন্ত খালিদ বিন অলিদ (রাঃ), ও ইরাকের উত্তর সীমান্তে

আয়াজ বিন গানম। মাত্র দুই বৎসরের স্বৈর-শাসনে আবু-বকর (রাঃ) গোটা আরব বিশ্বকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের পছন্দমতো নিযুক্ত করে যান আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। ওমর (রাঃ) মসনদে বসেই ইরাক ও ইরান নামক দুটি দেশকে তছনছ করে দিলেন। খালিদ বিন অলিদের (রাঃ) চেয়েও ভয়ঙ্কর, উবায়েদ, তালহা, যোবায়ের, আব্দুর রহমান, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, ও মো'তানার মত সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেন সামরীক ভার। ইরাক ও ইরানের কতো শত জীব, কতো মানুষ আর পশু যে ওমরের (রাঃ) তলোয়ারের নীচে প্রাণ দিয়েছিল তার সঠিক হিসেব হয়তো কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। মৃত্যুর পূর্বে ওমর (রাঃ) তাঁর নিজের ও আবু-বকরের (রাঃ) স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের দায়ীত্ব দিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র হাতে। তারা দুইজন অন্ধকার ঘরে গোপন বৈঠক করে নিয়ে এলেন সত্তর বৎসর বয়স্ক উসমানের (রাঃ) নাম। হজরত আলী (রাঃ) চিৎকার করে বলে উঠলেন- 'আমি মানি না, এটা প্রহসন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার, অন্যায়, এটা প্রতারণা।'

আরবী নববর্ষ, হিজরী ২৪ সনের মহর্‌রমের পহেলা তারিখ, ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের, ৭ নভেম্বর উসমান (রাঃ) খেলাফতের দায়ীত্ব গ্রহন করেন। উসমানের (রাঃ) খেলাফত লাভে যারপর নাই খুশি হলো উমাইয়াগণ, বিব্রত বোধ করলো হাশিমীগণ। পরপর তিনজন খলিফা ক্ষমতায় আসার পর, মক্কা থেকে আগত শরণার্থীদের দূরভিসন্ধি, অভাগা মদীনাবাসীদের বুঝতে বাকী রইলো না। তারা বুঝতে পারলো, কোরায়েশগণ মদীনা দখল করে নিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মদীনাবাসীর কোন স্থান নেই। এতদিন পরেও মোহাম্মদের (দঃ) সাম্যবাদী ইসলাম মক্কা-মদীনার মুসলমান, ও উমাইয়া-হাশিমীদের ভেতরকার বৈষম্য দূর করতে পারলো না। উসমানের (রাঃ) খেলাফতের মাধ্যমে এবার ইসলামের ঘরে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, যা হজরত আয়েশার (রাঃ) যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। প্রবন্ধের শেষভাগে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

উসমান (রাঃ) ক্ষমতা লাভের পরপরই এক বিরাট কান্ড করে বসেন। অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবীদের মতে যা ছিল মোহাম্মদের (দঃ) রচিত সংবিধান কোরআনের পরিপন্থী। উসমানকে (রাঃ) একসাথে তিনটি খুনের এক আসামীর বিচার করতে হয়। হজরত ওমরের (রাঃ) ছেলে হজরত ওবায়দুল্লাহ এক দিনে তিনটি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছিলেন। ঘঠনাটি ছিল এরকম-

হজরত ওমরের (রাঃ) কাছে, ফিরোজ আবু লুলু নামের এক ব্যক্তি, তার ওপর আরোপিত ট্যাক্সের পরিমান কমানোর আবেদন জানায়। পারসীয়ান দেশের ফিরোজকে মুসলমানগণ এক যুদ্ধে বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রী করেছিলেন। দাসত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ফিরোজ ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে পরবর্তিতে খৃষ্ট-ধর্মে ফিরে যায়। হজরত ওমর (রাঃ) ফিরোজের অনুরুধ প্রত্যাখান করেন। কুফায় বসবাসকারী ফিরোজ শিল্প কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে মদীনায় চলে আসে।

চলবে-